■ সাড়ে ১০ লাখ মামলার গোলকধাঁধায় ১২ কোটি মানুষ

■ ৭৬ ভাগই জমি সংক্রান্ত

আফাজদের হয়রানির শেষ নেই

সারাদেশে সব ধরনের আদালতে প্রায় সাড়ে দশ লাখ মামলা জমে আছে বিচারের অপেক্ষায়। এর মধ্যে সিংহভাগ মামলাই জমি সংশ্লিষ্ট। আইনী সীমাবদ্ধতা আর দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জমি সংক্রান্ত মামলাগুলো একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত মামলা গড়ায়। কখনো কখনো জমির মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়ে যায় দুই পক্ষের। তার উপরে দুর্ভোগ আর হয়রানিরতো শেষ নেই... লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

কেস স্টাডি-১

ছোট শিশু আফাজের বয়স যখন দুই বছর, তখন তার বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তার মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মায়ের অসুস্থতার সুযোগ নেয় তার শরিক বা বংশের লোকজন। তার পাগল প্রায় মায়ের কাছ থেকে একটি কাগজে টিপসই নেয়। এতে আফাজের বাবার সব জমি লিখে নেয় বংশের অন্যরা। নিয়মানুসারে তার মা এবং বাবার জমি লিখে নিলেও তাদের নামে থাকা জমি বিক্রি করতে পারেন না তার মা। নিয়মের তোয়াক্কা না করে শরিকের লোকেরা সব জমি দখল করে নেয়। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান আফাজ ও তার বোন হয়ে পড়ে পথের ভিখারি। তার মা সুস্থ হলে তিনি বুঝতে পারেন কি ক্ষতি তাদের হয়েছে। যেসব জমির জন্য টিপসই নিয়েছিলো তার মধ্যে ২৩ বিঘা সম্পত্তি ছিলো আফাজ ও তার বোনের নামে। বিধবা মা তার অবুঝ দুটি সন্তান নিয়ে অথৈ সাগরে পড়েন। এ অবস্থায় নাবালক এ দুটি বাচ্চার নামে যেসব জমি আছে তা উদ্ধারে এগিয়ে আসেন আফাজের চাচা শেখ গোলাম রহমান। আদালতের শরাণপন্ন হন তিনি ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ সালে আদালত গোলাম রহমানের অর্থাৎ আফাজের পক্ষে রায় দেন। আদালত রায়ে নির্দেশ দেন আফাজ দু'ভাইবোন যতোদিন সাবালক না হবে ততোদিন পর্যন্ত এই জমি দেখাশোনা করবে তার শরিকরা। এই রায়ে বিবাদী পক্ষ খুশি হয়। নিয়মানুসারে জমিতে উৎপাদনকৃত সব ফসলের হিস্যা সাবালক হলে তাদের ফেরত দিতে হবে। আফাজের শরিকরা সেটা তো করেইনি বরং আবার জাল দলিল তৈরি করে জমি দখল করে নেয়। এর মধ্যেই তার চাচা শেখ গোলাম রহমানও মৃত্যুবরণ করেন। ফলে শরিকের লোকদের আর পায় কে। ধনীর দুলাল আফাজ বিধবা মায়ের আদরে আর সামাজিক অবহেলায় বড় হতে থাকে। ১৬/১৭ বছর বয়সে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান রেলওয়েতে চাকরি পান। পোস্টিং ছিলো চট্টগ্রাম। চাকরি পাবার পর আফাজ সাহেব আবার আদালতে আইনি লড়াইয়ে ফিরে আসেন। বাড়ি কুষ্টিয়া হওয়ায় মামলা চালানোর জন্য তাকে চট্টগ্রাম থেকে কুষ্টিয়া আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকতে হতো। বিবাদী পক্ষও উকিলকে বলে ঘন ঘন মামলার তারিখ পরিবর্তন করতেন। মামলা না চালানোর জন্য তার কলিগ, মা, বোন নিষেধ করলেও তিনি শোনেননি। তার একই কথা, আমার বাবার জমি

রাজবাড়ির ভূমিহীন শাহজাহান মন্ডল, মামলা চালাতে গিয়ে সে এখন নিঃস্ব

যেকোনো মূল্যে উদ্ধার করতে হবে। বছরের পর বছর যায়, মামলা শেষ হয় না। এ কোর্ট, সে কোর্ট, এই দিন, সেই দিন করে চলতে থাকে সময়। অনেক সময় আফাজ সাহেব হতাশ হয়ে পড়তেন কিন্তু দমে যেতেন না। কথা প্রসঙ্গে তিনি ২০০০কে জানিয়েছেন, ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম-কুষ্টিয়া আসা-যাওয়া করতে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে মামলাকৃত জমির চেয়ে বেশি জমি রাখা যেতো। আফাজ সাহেব একা, অন্যদিকে তার শরিকরা অনেক। সময়ের বিবর্তনে শরিকের লোকসংখ্যাও বাড়তে থাকে। ফলে তারা আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৯০ সালের মে মাসে কুষ্টিয়া জজকোর্ট আফাজ সাহেবের পক্ষে রায় দেন। ১৯৪৮ সালের পর ১৯৯০-এ দুটো রায়ই আফাজ সাহেবের পক্ষে যায়। আফাজ সাহেব শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। রায় হলেই তো আর জমি ফেরত পাওয়া যায় না। আবার আদালত, ইনজাংশন, স্থানীয় প্রভাবশালীদের ঘুষ দেয়া। অনেক ঝামেলার পর আফাজ সাহেব তার বাবার সম্পত্তি ফেরত পান। কিন্তু তিন যুগেরও বেশি সময় তার যে টাকা আর সময় নষ্ট হয়েছে তা দিয়ে ফেরতকৃত জমির কয়েকগুণ বেশি জমি কিনতে পারতেন।

নোয়াখালী সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা ২৫ বছর চলার পর পক্ষ দোষের কারণে খারিজ হয়ে গেছে সম্প্রতি। শহরতলির মাস্টারপাড়ার দুই প্রতিবেশীর জমির মালিকানা বিরোধ নিয়ে আদালতে মামলা হয় ১৯৭১ সালে

কেস স্টাডি-২

রাজবাড়ীর বিল পাকুরিয়া। বিলটির আয়তন ১১৪.০৮ একর। জমিদারি যুগে এই বিলটির মালিক ছিলেন শ্রী রানী হর্ষমুখী দাশী, শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ রাধাকান্ত এবং শ্রী রাধাকান্ত। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর বিলটির পুরো জমিই সরকারি খাস খতিয়ানে চলে আসে। কিন্তু এসএ রেকর্ডের সময় স্থানীয় কয়েকজন জোতদার ভূমি প্রশাসনের সহায়তায় ভুয়া রেকর্ড তৈরি করে। এর পর জোতদার রহিম মোল্লা, মালেক মোল্লা গং বিলের জমি দখলে নেয়।

১৯৭৪ সালের ভূমিহীনরা খাস জমিতে তাদের আইনগত অধিকারের দাবিতে আদালতে মামলা দায়ের করে। কয়েক বছর পর ১৯৮১ সালে দুই জোতদার ৩২.১১ একর জমির মিথ্যা স্বত্ব দাবি করে সাবজজ আদালতে মামলা দায়ের করে। একইভাবে ১৯৮৫ সালে জোতদার মালেক মোল্লা আরেকটি মামলা দায়ের করে।

আদালতে জোতদারদের দাবি মিথ্যা প্রমাণ হওয়ায় '৯৪ সালে নালিশি জমিকে খাস জমি বলে রায় প্রদান করে। জোতদাররা একই বছর এই রায়ের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে আপিল মোকাদ্দমা করে। অতিরিক্ত জেলা জজ নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি রহিত করে মামলা পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতে প্রেরণ করে। এরপর '৯৮ সালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বিল পাকুরিয়ার জমি খাস হিসেবে গণ্য করে এই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর জোতদাররা আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। এভাবে ৩০ বছর যাবৎ বিল পুকুরিয়ার জমি নিয়ে মামলা-পাল্টা মামলা চলছে। এ পর্যন্ত এই জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে অর্ধশতাধিক দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা হয়েছে।

স্থানীয় ভূমিহীন নেতা শাহজাহান মন্ডল ২০০০কে জানান, এই মামলাগুলো চালাতে সরকার, ভূমিহীন এবং জোতদারদের প্রায় ২৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু মামলা এখনো শেষ হয়নি। মামলা শেষ হতে আরো কতদিন লাগবে কেউ জানে না।

এই বিরোধের কারণে সংঘর্ষ হচ্ছে মাঝেমধ্যেই। কৃষিকাজ এবং ফসল উৎপাদন অনেক কম হচ্ছে। বিল পাকুরিয়ার মামলা আরো কত বছর চলবে তা কেউ জানে না।

কেস স্টাডি-৩

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের মাত্র দেড় ডেসিমেল জায়গা নিয়ে মামলা চলছে দীর্ঘদিন থেকে। বারাহীনগর গ্রামের হানাফি বেগমের পরিবার এক সময় গরিব ছিলো। পার্শ্ববর্তী ধনী প্রতিবেশী মোহসীন আলমদের কাজ করে হানাফি বেগমের স্বামী তার সংসার চালাতেন। নিজেরা অশিক্ষিত হলে ছেলেদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন এই দম্পতি। পাস করার পর ছেলেরা সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদে চাকরি পেয়ে যান।

হানাফি বেগমের পরিবারে সুদিন আসে। এক পর্যায়ে হানাফি বেগমের পরিবার এখন ঐ এলাকায় শিক্ষা এবং সম্পদে সবাইকে পেছনে ফেলে দেয়।

হানাফি বেগমের ছেলেদের এই উত্থানকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি মোহসীন আলমরা, সুযোগ পেলেই তারা এদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। মেইন রোড থেকে হানাফি বেগমদের বাড়িতে ঢোকার পথটি বেশ সরু ছিলো। গাড়ি নিয়ে ঢোকা যেত না। রাস্তাটি প্রশস্ত করার জন্য তারা পথটির দু'ধারের মাত্র দেড় ডেসিমেল জায়গা ক্রয় করেন ১৯৯৭ সালে। অমনি অগ্রক্রয় মামলা ঠুকে দেয় মোহসীন আলমরা।

বেগমগঞ্জ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়ার পর জেলা জজ আদালতে বাদী আপিল করে। চলতি বছরের মে মাসে আপিলটি খারিজ হয়ে যাওয়ার পর

তারা এখন হাইকোর্টে যাওয়ার চিন্তা করছে। তাহলে আরো অন্তত ৫ বছর ঝুলে যাবে মামলাটি।

জমির দামের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি খরচ করছে দু'পক্ষ, তার পরও থামছে না তারা।

কেস স্টাডি-৪

নোয়াখালী সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা ২৫ বছর চলার পর পক্ষ দোষের কারণে খারিজ হয়ে গেছে সম্প্রতি। শহরতলির মাস্টারপাড়ার দুই প্রতিবেশীর জমির মালিকানা বিরোধ নিয়ে আদালতে মামলা হয় ১৯৭১ সালে। আব্দুল গফুর গংদের বিরুদ্ধে ফরিদ মিয়া গংদের দায়ের করা এই মামলায় অর্ধশতাধিকবার তারিখ পড়লেও কোনো বার সাক্ষী নেই, উকিল নেই, জজ ছুটিতে– এরকম একের পর এক তারিখ পড়ার পর ১৯৯৬ সালে সব শুনানি শেষ হওয়ার পর যখন রায় প্রায় চূড়ান্ত, তখন বিবাদী আইনজীবী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে যারা এই জমির মালিকানা স্বত্ব পাওয়ার কথা তাদের সবাইকে এই মামলায় আসামি করা হয়নি। প্রশ্নটা হচ্ছে, মামলার এই দুর্বলতাটা ২৫ বছর পর ধরা পড়লো কেন। এই ২৫ বছরে দু'পক্ষেরই লাখ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। দুই পক্ষ এবং আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে। হয়রানির শিকার হয়েছে দু'পক্ষই।

পক্ষ ঠিক করে এই বিরোধ আবার আদালতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী গোলাম আকবর। হয়তো আবার ২৫ বছর লেগে যাবে এই মামলার রায় হতে। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট বা আপিল বোর্ড পর্যন্ত গড়ালে ৫০ বছরও লেগে যেতে পারে।

সাড়ে ১০ লাখ মামলা

গত ২৬ জুন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সংসদে বলেছেন, দেশের সকল পর্যায়ের আদালতে মোট ১০ লাখ ৪৫ হাজার ৮৯৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে দেওয়ানি ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৮৯৩টি, ফৌজদারি ৬ লাখ ৪৩ হাজার ৬৯৭টি এবং রিট মামলার সংখ্যা ২২ হাজার। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মহাসচিব তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, এই ১০ লক্ষাধিক মামলার মধ্যে ৭৬ শতাংশ সরাসরি জমি সংক্রান্ত এবং আরো ২০ শতাংশ পরোক্ষভাবে ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি আরো দেখিয়েছেন, এই মামলাগুলো চালাতে সরকার এবং জনগণের ৩৫ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, যা এক বছরের বাজেটের দেড়গুণ। আবুল বারকাত আরো দেখিয়েছেন, এর মধ্যে ২৪ হাজার কোটি টাকাই ঘুষ বাবদ মানুষ খরচ করেছে।

এই গবেষণায় হিসাব করে দেখানো হয়েছে দেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক মামলার সঙ্গে জড়িত।

কোন পথে সমাধান

বর্তমানে সারা দেশে ভূমি জরিপ চলছে। জরিপ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সারা দেশে ভূমি বিষয়ক মামলার পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। মামলার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘসূত্রতা এবং মানুষের হয়রানির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এই মামলা জট কিভাবে দ্রুত শেষ করা যায় তা নিয়ে সরকার এবং দাতা সংস্থাগুলো বিকল্প পথ খুঁজছে। সরকার গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন পাস করেছে। কিন্তু এই আইন খুব একটা কাজ দেবে বলে মনে করছেন না আইনজ্ঞরা। আইনজীবীরা বলছেন, এমন পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে যাতে স্থানীয় বিরোধগুলো আদালতে আসার আগে স্থানীয় পর্যায়েই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্য সালিস ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে পুনঃ প্রবর্তনের কথা বলছেন।

বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুম একটি ফর্মুলা প্রস্তাব দিয়েছেন যা সরকারি নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুম ভিয়েতনাম এবং চীনের স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত সালিস ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা আইনগতভাবে এখানে প্রবর্তনের প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, এ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে আদালতে মামলার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। এজন্য প্রথমেই একটি আইন পাস করতে হবে যার নাম লোকাল পিপল কাউন্সিলেশন কাউন্সিল (এলপিসিসি) অথবা স্থানীয় সালিস পরিষদ হতে পারে। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে সালিস প্যানেল তৈরি হবে। এই প্যানেলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সব পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মহিলা প্রতিনিধিও থাকতে

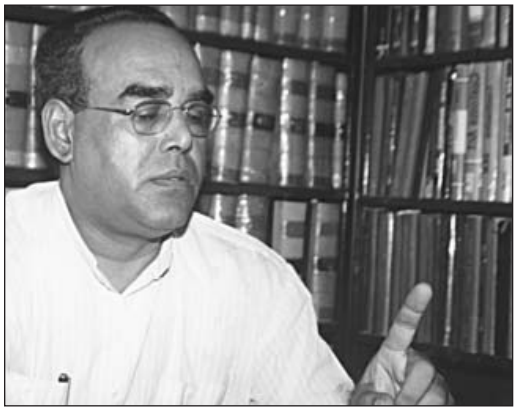

'আমাদের প্রচলিত যে বিচার ব্যবস্থা তাতে রায়ের পর এক পক্ষ হারে আরেক পক্ষ জেতে। ফলে রায়ের পর দু'পক্ষের শত্রুতা আরো বেড়ে যায়'

জোয়াদ আল মালুম

অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

হবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো মেম্বার এই প্যানেলে থাকবেন না। সালিস প্যানেলের আকার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জনসংখ্যার অনুপাতে কম-বেশি হবে। আইনে থাকবে স্থানীয় পর্যায়ে জমি বা অন্য কোনো কিছু নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে এই সালিস পরিষদ করবে প্রথমে যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, সেখানে সরেজমিনে গিয়ে সেখানকার মানুষদের নিয়ে তা মীমাংসার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। তারা যদি মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা একটি সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে যা নিয়ে বাদী বা বিবাদী পক্ষগুলো আদালতে যেতে পারবে। সালিস পরিষদে না এসে বা তাদের সার্টিফিকেট না নিয়ে কেউ আদালতে যেতে পারবে না। এক্ষেত্রে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তারা ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করবে। ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সালিস পরিষদকে বিষয়টি মীমাংসা করার দায়িত্ব দেবে। ওয়ার্ডে যে দীর্ঘ সালিস প্যানেল থাকবে সেখানে বাদী পক্ষ ২ জন বিচারক পছন্দ বিবাদ পক্ষ ২ জন এবং একজন মহিলা থাকবে। এছাড়া প্যানেলের বাইরে থেকে বাদী এবং বিবাদীর ২ জন করে প্রতিনিধি থাকবে। এভাবে সদস্য নিয়ে সালিস বসবে। সংখ্যাটা বেজোড় হবে কারণ ভোট দেয়ার ব্যাপার আছে। এরা উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে দু'পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করবে। এভাবে নয় বেশির ভাগ বিরোধ স্থানীয় পর্যায়েই মিটে যাবে।

আমাদের প্রচলিত যে বিচার ব্যবস্থা তাতে রায়ের পর এক পক্ষ হারে আরেক পক্ষ জেতে। ফলে রায়ের পর দু'পক্ষের শত্রুতা আরো বেড়ে যায়। নতুন নতুন আরো মামলার ক্ষেত্র তৈরি হয়। অন্যদিকে সালিসের রায় হবে দু'পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ কমে আসবে। অনেক সময়

যেখানে আছে খাস জমি সেখানেই আছে বিরোধ, আছে মামলা পাল্টা মামলা

রায়ে ডিক্রি দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, সালিস পরিষদের ডিক্রি দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না। তাই তারা তাদের অভিমত লিখিতভাবে আদালতে পেশ করবে। আদালত সেটি বিবেচনা করতে পারে। অ্যাডভোকেট জোয়াদ আল মালুমকে প্রশ্ন করেছিলাম, এখন গ্রামগ্রঞ্জে যে সালিস প্রথা চালু আছে তা তো টাউট বাটপারদের দখলে। এক্ষেত্রে এটি টাউটদের হাতে চলে যাবে না তো? উত্তরে তিনি বলেন, 'বর্তমান সালিস ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাই তাদের অ্যাকাউন্টিবিটি, রেসপনসিবিলিটি বা অবলিকেশন বলতে কিছু নেই। গ্রাম্য টাউটরা তাদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্য সালিস ব্যবস্থাটা ব্যবহার করে। আর এটি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ থাকবে। এছাড়া সালিসে যেহেতু উভয় পক্ষের সমানসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকবে, তাই একচেটিয়া কিছু হতে পারবে না।' জোয়াদ আল মালুম বলেন, 'হাজার বছর ধরে আমাদের এখানে গ্রাম্য সালিস ব্যবস্থা চালু ছিল। তখন বিরোধ নিষ্পত্তি হতো স্থানীয় পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। ফিরিঙ্গি এবং ওলন্দাজরা এসে আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী প্রথা ধ্বংস করে দেয়।'

মামলার ভারে জর্জরিত আদালত, দীর্ঘসূত্রতা আর হয়রানির শিকার প্রায় পুরো দেশের মানুষ। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা যেহেতু মামলা জট কমাতে পারছে না, তাই স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য যে প্রস্তাবগুলো বিভিন্ন মহল থেকে আসছে, সেগুলো পরীক্ষা করে একটি গ্রাম্য সালিস ব্যবস্থা আইনগতভাবে যদি চালু করা যায়, তবে আদালতের মামলার সংখ্যা কমে আসবে বলে আশা করা যায়। শুধু ভিয়েতনাম আর চীন নয়, আমাদের দেশেই মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এ ধরনের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি মডেল কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছে।

জানা গেছে, এই উদ্যোগের ফলে সেখানে ৭৫ ভাগ বিরোধ আদালতে আসার আগেই স্থানীয় পর্যায়ে মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পাত্রী চাই : সঙ্গত কারণে দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী ব্যবসায়ী (৪০) পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩২ বয়সের রুচিশীল, সুন্দরী, শিক্ষিতা (সম্প্রতি বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, চাকরিজীবী, নিঃসঙ্গ, বিদেশে সিটিজেনশিপ) পাত্রী চাই। পাত্রীর ইচ্ছানুযায়ী বিদেশে যেতেও আগ্রহী। রঙিন ছবি, (টেলিফোন নং যদি থাকে) বিস্তারিত উল্লেখ করে সরাসরি লিখুন। সব ধরনের গোপনীয়তা ১০০% ।–বিজ্ঞাপন দাতা, সাপ্তাহিক ২০০০, বক্স নং-৩০১, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

***

পড়াব : রেজা (বুয়েট, এক্সনটরডেম, এসএসসি-৯১৫ + এইচএসসি-৯১৭) (পঞ্চম-দ্বাদশ, কেজি- ও/এ লেভেল) ফিজিক্স/কেমিস্ট্রি/ম্যাথ/স্ট্যাটিস্টিক্স এ+ এর প্রত্যাশায়। # ০১৭২-২২৫৮২০।

***

পড়াব : প্রদীপ (ঢাবি, ইংরেজি) এসএসসি-৯০৫ এইচএসসি-৯১৮ (প্রথম-অষ্টম, অল সাবজেক্ট/এসএসসি, এইচএসসি-ইংরেজি, কেজি- স্ট্যান্ডার্ড সেভেন) # ০১৭২-১০৫১৭০

***

আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত এবং কবিতা ও ছবি আঁকাসহ ভ্রমণে উৎসাহী বান্ধবী চাই। বয়স কোনো সমস্যা নয়।– Phone : 7101396, Code : 228 (শুধুমাত্র শুক্রবার)

***

যেতে চাই অনেক দূরে, অন্ধকার থেকে আলোর গভীরে, যেতে চাই হৃদয়ের গহীন অরণ্যে। কেউ কি আছেন এই আমাকে ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে স্বপ্নলোকে নিয়ে যাবেন? সহযোগী হিসেবে পেতে চাই সমমনা কাউকে। আমি দেবো নির্ভরতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বাস।– শাহরিয়ার মাসুদ, ফোন-৭১৭৫৩৬৬

***

হে বন্ধু, শুনিবে কি আমার হৃদয়ের কথা? শুনিবে কি আমার কষ্টের কথা? আমি বলিব তোমায় আমার কথা শুনিবে কি তুমি? ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে ঠিকানা জানান। কথা বলতে চাই। নিজে হালকা হতে চাই।– শিশির সুলতানা, বয়রা, খুলনা

***

খুলনার শারমিনকে বলছি, তোমার চিঠিটা পড়ে খুব খারাপ লাগলো। তাই কামনা করি তোমার আকাশে ভালোবাসা দেখ লক্ষ লক্ষ তারা। তুমি আমার মাঝে ডুব দিয়ে দেখ আমি বন্ধুহারা। বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইল।– মাহমুদ আলী (মামুন), প্রযত্নে ,সায়েরা ভিলা (তৃতীয় তলা), ৪৪৬ নং পশ্চিম রামপুরা, মক্কি মসজিদ গলি, ঢাকা-১২১৯

***